ভারতের বিশ্বায়ন - উত্তর দৃশ্যকলা : বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতা

মৃণাল ঘোষ

অল্প কিছুদিন আগে কলকাতার কোনও একটি আর্ট গ্যালারিতে আলোচনাসভা হয়েছিল, তাতে বিষয় ছিল: বিশ্বায়ন-উত্তর ভারতীয় দৃশ্যকলা কি অনেক বাস্তববাদী ও গণতান্ত্রিক হয়েছে? আলোচকদের অনেকেই ছিলেন তরুণ প্রজন্মের শিল্পী ও শিল্প - ঐতিহাসিক। তাঁরা তাদের মতো করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপর আলেচনা করেছিলেন। তাতে সাম্প্রতিক দৃশ্যকলার নানা বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছিল। তবু বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। এ লেখায় আমরা সে চেষ্টাই করব। অর্থাৎ বিশ্বায়ন - উত্তর শিল্প - পরিস্থিতিকে একটু বোঝার চেষ্টা করব।

আলোচনার উক্ত নির্ধারিত বিষয়টি অন্য একটি ভাবনাকে উসকে দেয়। বিশ্বায়ন - পূর্ব আমাদের দৃশ্যকলায় বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতার মাত্রাটা কেমন ছিল। তাতে কি বাস্তবতার প্রকাশ তেমনি কিছু ছিল না? গণতান্ত্রিকতা ও কি খুব অবরুদ্ধ ছিল সেখানে? অর্থাৎ শিল্প কি বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কি কোনও যোগ ছিল না? বা খুব সীমিত ছিল কি সেই সংযোগ? এখানে 'বাস্তববাদী' ও 'গণতান্ত্রিক' — এই শব্দদুটি ঠিক কী বোঝায়, সেটাও একটু অনুধাবন করে নেওয়া যায়। বিষয়টি ইংরেজিতে বলা ছিল। তাতে ''realistia'' ও ''democratic'' এই শব্দদুটি ছিল। বেশি জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজভাবেই শব্দদুটিকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি আমরা। শিল্পের বাস্তববাদ যে স্বাভাবিকতাবাদ বা 'ন্যাচারালিজম' নয়, সেটা সকলেরই জানা। দেশ - কাল অন্বিত বাস্তব পরিস্থিতি থেকে কখন জেগে ওঠে শিল্প বা তার ভিতর যখন প্রতিফলিত হয় সেই বাস্তবতার সমস্যা, তখনই সেই শিল্পকে আমরা বাস্তববাদী বা রিয়েলিস্টিক বলতে পারি। আর 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি যে প্রাথমিক দ্যোতনা আনে তা হল, কোনও দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষের সমর্থন বা অংশগ্রহণ। কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে তো সেটা প্রযোজ্য হতে পারে না। সেখানে অর্থটা দাঁড়ায় একটি নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর বাইরে শিল্প কি অনেক মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারছে? অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃশ্যকলা কি কোনও সাড়া জাগাতে পারছে? শিল্পকলা কি অনেক দর্শককে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করতে পারছে?

বাস্তবতার প্রসঙ্গটি নিয়েই প্রথমে একটু ভাবা যেতে পারে। আধুনিক পর্বে আসার আগে আবহমানের শিল্পের দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, শিল্পের ভিতর বাস্তবতার ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, সেটা বোঝার জন্য। প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগে মানুষের যে শিল্পপ্রকাশ, সেটা তার জীবনের বাস্তবতা থেকেই উৎসারিত হত। শিল্প ছিল আদিম মানুষের জাদু প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ। আর জাদু - প্রক্রিয়া ছিল তার অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃতির প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় ছিল জাদু - আচার। মানুষের শিল্প এই জাদু আচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আদিম শিকারজীবী মানুষ জীবনের জন্যই শিল্পসৃষ্টি করত। খাদ্য সংগ্রহকে সহজতর করার জন্য। নিজস্ব প্রজন্মের গতিপ্রবাহকে অচঞ্চল রাখার জন্য। তাই শিল্প তার কাছে বিলাস ছিল না। জীবন থেকে বিচ্ছিন্নও ছিল না। কাজেই আদিম মানুষের শিল্প তার বাস্তবতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। সে বাস্তবতার প্রতিরূপ গড়ত না। প্রতীক গড়ত। আর তাঁর শিল্প গণতান্ত্রিকও ছিল। সে শুধু নিজের জন্য শিল্প গড়ত না। শিল্প ছিল তাঁর কাছে তাঁর কৌমচেতনার প্রকাশ।

এই জাদুচেতনা মানুষের ভিতর আজও সক্রিয়। জাদুচেতনা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল পুরাণকল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিথ'। এই পুরাণকল্প মানুষের একেবারে মগজচেতনার ভিতর প্রোথিত হয়ে আছে। মানুষের বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে অনেক সক্রিয় হয়েছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিই মানুষের সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক হয়েছে। কিন্তু মগ্নচেতনায় বিধৃত পুরাণকল্প বা জাদুচেতনা নিষ্ক্রিয় বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। সভ্য মানুষের চৈতন্য দুভাবে উন্মোচিত হয়। একদিকে অতি নিভৃতিতে থাকে পুরাণকল্প বা জাদুবিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে থাকে বুদ্ধি বা যুক্তি সক্রিয়তা। ইংরেজিতে বলে 'মিথোজ' আর 'লোগোজ' এই দুইয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় সভ্য মানুষের জীবন। তাঁর শিল্পও।

অরণ্যচারী শিকারজীবী মানুষ যখন কৃষিজীবী হয়েছে, তখন তাঁর জাদুচেতনা বা পুরাণকল্পচেতনার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর শিল্পও তাদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রকাশে অন্তর্মুখী তীব্রতার বদলে ছন্দিত সুষমা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেগে উঠেছে লৌকিক শিল্প। আদিম শিল্প আজও যেমন একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি, লৌকিক শিল্পও নানা রূপান্তরের পথে আজও অনেকটাই সক্রিয়। এই লৌকিক শিল্পের ভিতর বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতা কেমন করে প্রকাশিত হয়? লোকশিল্প স্বাভাবিকতাকে অনেক সরল করে নেয়। অনেকসময় তাকে সাংকেতিকও করে তোলে। দৃশ্যগত বাস্তবতা থেকে তা অনেক দূরে সরে যায়। কিন্তু এই দূরে সরে যাওয়াটা নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরের বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকেই। সে গড়ে তুলতে চায় এক আদর্শায়িত সৌন্দর্য। বাস্তব থেকে উদ্ভূত, কিন্তু বাস্তব - নিরপেক্ষ কল্পনার প্রতিরূপ। বাস্তবের এই সমালোচনার ভিতরই থাকে লৌকিকের বাস্তবচেতনা।

লৌকিক শিল্প প্রত্ন শিল্পের মতোই সর্বাংশ কোনও একক ব্যক্তির একান্ত আত্ম - কেন্দ্রিক প্রকাশ নয়। একটি গোষ্ঠীর যৌথচেতনা দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই লোকশিল্পের মধ্যেও কৌমচেতনার বিশেষ ভূমিকাও থাকে। এদিক থেকে লোকশিল্পও গণতান্ত্রিক। বহু মানুষের সমবেত মননে তা গড়ে ওঠে। বহু মানুষ তা উপভোগও করে। লোকশিল্পের প্রকাশভঙ্গিতে দুটি দিক আছে। একটি বাস্তবসম্পৃক্ত। বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকে তাতে। গ্রামীণ মানুষের জীবনেরই কথা বলা হয়। এখনও তো ডোগরা ভাস্কর্যে বা মেদিনীপুরের লৌকিক চিত্রে বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা বিষয় আমরা দেখি। কালিঘাটের পট বা বটতলার কাঠখোদাই ছবিতে প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণের অজস্র দৃষ্টান্ত সকলের জানা। লোকশিল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নিরপেক্ষ বিষয়ও থাকে। দুভাবে থাকতে পারে সেটা। পুরাণকল্পের মধ্যে দিয়ে থাকতে পারে। পুরাণকল্পের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার পরোক্ষ অনুষঙ্গ যেমন আসতে পারে, বাস্তবতা নিরপেক্ষ ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গেরও প্রতিফলন ঘটতে পারে। আবার সরাসরি সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন আদর্শায়িত বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্য দিয়েও থাকতে পারে। আলপনা যার একটি সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত। নানা অঞ্চলের লৌকিক শিল্প ঘোড়া, হাতি বা অন্যান্য প্রাণীর সরলীকৃত অবয়বের যে রূপায়ণ, সেগুলি বাস্তবতা - নিরপেক্ষ আদর্শায়িত রূপায়ণের দৃষ্টান্ত। তবে এগুলিও সৌন্দর্যের একটি আদর্শ রূপ তুলে ধরে, যা মানুষের কল্পনাকে, জীবনযাপনকেও সমৃদ্ধ করে এবং সেভাবে তার একটা সামাজিক তাৎপর্যও তৈরি হয়। লৌকিক যখন তার নিজস্ব পরিমন্ডলের মধ্যে গড়ে ওঠে ও বেড়ে ওঠে, তখন তার মধ্যে সমাজের বৃহত্তর অংশের যোগ থাকে তার সঙ্গে, পার্টিসিপেশন থাকে। সেই অর্থে গণতান্ত্রিকতা লৌকিকের একটি বৈশিষ্ট্য।

এই গণতান্ত্রিকতা থেকে লৌকিক বিচ্ছিন্ন হয যখন তাকে শহরের পরিমন্ডলে স্থাপন করা হয়। কেননা এই শিল্প প্রক্রিয়ায় তাঁদের কোনও সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে না। এই সমাজেও কিন্তু আমরা পুরাণকল্পের অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। আজকের শহরের পরিমন্ডলেও যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাতে পুরাণকল্প এখনও দারুণভাবে সজীব। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এর প্রত্যক্ষ

দৃষ্টান্ত। এসব দেবদেবীর যে মূর্তি কল্পনা তা বহুযুগ ধরে পুরাণকল্প বাহিত হয়ে আজকের দিনে এসে পৌঁছেছে। লক্ষ্মীপূজায় যে কলাবৌ ব্যবহার করা হয়, কলাগাছের খোল দিয়ে যে নৌকা তৈরি হয়, যে আলপনা দেওয়া হয়, তার ভিতর লৌকিক ও পুরাণকল্পের সমন্বয় থাকে।

সভ্যতার বিবর্তনে সমাজে যখন পরশ্রমজীবী জনগোষ্ঠী তৈরি হল, তখন শিল্পের স্বরূপও পাল্টাতে লাগল। আদিম ও লৌকিকের সমান্তরালে উচ্চকোটির সম্পদশালী মানুষ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিশীলিত এক শিল্পরূপ বিকশিত হতে লাগল। এই ধ্রুপদি শিল্পের শিল্পী যাঁরা, তাঁরা উঠে এসেছেন লৌকিক স্তর থেকেই। কিন্তু ভিন্ন রুচির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রকাশভঙ্গি ক্রমশ পাল্টেছে। আমাদের দেশে ভারতের শিল্পকর্মে, ভাস্কর্যে বিশেষ, আদিম ও লৌকিক স্তর থেকে ধ্রুপদি স্তরে উন্নয়নের চিহ্নগুলি শনাক্ত করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারহুতের সময় থেকে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে কোনারক পর্যন্ত আমাদের দেশে ধ্রুপদি শিল্পের যে বিকাশ তার ভিতর মানবিক প্রজ্ঞার ও সৌন্দর্যচেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এই ধ্রুপদি শিল্পেও বাস্তবতা সব সময়ই আদর্শায়িত হয়েছে। মানুষের ভিতর প্রতিফলিত হয়েছে স্বর্গীয় আলো। কিন্তু সেই আলোর মধ্যেও পার্থিব জীবনের বাস্তবতার ছায়া - প্রচ্ছায়ার প্রতিফলন যে পড়েনি, তা নয়। শ্রমজীবী মানুষের আলেখ্য অনেক সময়ই রচিত হয়েছে। সাঁচীর তোরণের ভার বহন করেছে যুথবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ তাদের মাথার উপর তোরণটিকে ধারণ করে। এরকম দৃষ্টান্ত ভারতীয় ভাস্কর্যে খুব বিরল নয়। গান্ধারের শীর্ণকায় বুদ্ধমূর্তি থেকে চতুর্দশ শতকে তাঞ্জোরের শীর্ণকায়া কালীমূর্তির উপস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বাস্তবতার নানারকম প্রতিফলন অনেক সময়ই ঘটেছে। বিভিন্ন ধর্ম - সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের বাতাবরণ তো অনেক সময়ই ছিল। শিল্পে তার ছায়া পড়েনি, তা নয়।

ভারতীয় ধ্রুপদি শিল্পে অলৌকিকতার যে তত্ত্ব এক সময় প্রাধান্য পেয়েছিল, পরবর্তী কালে সে ধারণা পাল্টেছে। নীহাররঞ্জন রায় বা রোমিলা থাপারের মতো শিল্পতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন, অলৌকিকতা নয়, পার্থিবতাই ভারতীয় শিল্প আদর্শের মূল ভিত্তি। অজন্তার ছবি, মৌর্য, শুঙ্গ বা মথুরার ভাস্কর্যের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখা যায়, ছন্দিত এক সুরেলা সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। এর অন্তরালে খুব সূক্ষ্মভাবে ছিল বাস্তবের প্রতিফলন। প্রবহমান জীবনের নানা ছায়া - প্রচ্ছায়া। তবে ধ্রুপদি চিত্র বা ভাস্কর্য গড়ে উঠত ধর্মীয়চেতনা ও আচারকে ভিত্তি করে। ভিত্তিচিত্র বা মন্দির ভাস্কর্য কোনও একক সংগ্রাহকের কুক্ষিগত হয়ে গৃহবন্দী হয়ে থাকত না। সেই শিল্পের সঙ্গে সমস্ত সাধারণ মানুষেরই প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটত। তাঁরা ধর্মীয় নিষ্ঠায় সেগুলির রসাস্বাদন করতেন। এদিক থেকে ধ্রুপদি ভারতীয় শিল্পে গণতান্ত্রিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই ছিল সেটা আসত ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে। পুরাণকল্প ও জাদুচেতনার সঙ্গে যোগ থাকত তার। অজন্তার ভিত্তিচিত্রগুলি বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে করা। যাঁরা করেছেন, তাঁরা ধর্মীয় বা অধ্যাত্মচেতনার উদ্বুদ্ধ হন, সেটা ছিল উদ্দেশ্য। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে অজস্র মন্দির তৈরি হয়েছে বা আরও পরবর্তী কালের বাংলার যে টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ মন্দিরগুলো, সবই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মীয় আচারও অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। সাধারণ মানুষকে ধর্মচেতনায় বা পুরাণকল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য। মানুষের কাছেও মন্দির দর্শন ছিল একটি পুণ্য কাজ। ধর্মের সূত্রেই শিল্পের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ঘটত। প্রাচীন যুগে শিল্পের গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি ছিল ধর্ম।

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে মুসলিম আধিপত্য যখন বাড়তে থাকে, তখন অনেক হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসও হয়ে যায় এবং নতুন প্রসারও সংকুচিত হয়। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির শিল্পচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে রাজদরবারের অন্তঃপুর। মিনিয়েচার পেইন্টিং বা অনুচিত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে সেই সময়। পশ্চিম ভারতের অনুচিত্র, মোগল রাজ দরবারের অনুচিত্র, রাজস্থানি বা পাহাড়ি অনুচিত্র— সবই সম্ভ্রান্ত শ্রেণির অন্তঃপুরের ছবি। রাজা বা জমিদার শ্রেণির ইচ্ছায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষ শিল্পী কারিগররা সেসব কাজ করতেন। বাইরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যোগ ছিল খুবই কম। মধ্যযুগে এসেই প্রথম উচ্চকোটির দরবারি শিল্পে গণতান্ত্রিকতা সংকুচিত হল। কিন্তু সাধারণ জীবনপ্রবাহে যে লৌকিক শিল্পের চর্চা সেখানে মাটির কাছাকাছি মানুষের নিরন্তর যোগাযোগ ছিল। মোগল অনুচিত্রের বিষয় ছিল অনেকটা সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ। রাজন্যবর্গের শৌর্য, বীর্য, মাহাত্ম্য, প্রেম, যুদ্ধ, নিসর্গ ও পশু - পাখির রূপায়ণ - বিষয় হিসেবে এসবই প্রাধান্য পেত। রাজপুত বা পাহাড়ি অনুচিত্রে এসব বিষয়ে পাশাপাশি গুরুত্ব পেত ধর্মীয় ও পুরাণকল্পমূলক বিষয়। এসবেরই ছদ্মবেশে বাস্তবতার সাধারণ স্তরের কিছু প্রতিফলনও যে ঘটত না, তা নয়। কিন্তু তা ছিল খুবই সীমিত।

অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তার রাজন্যবর্গের সমৃদ্ধিকে সংকুচিত করে। তাদের ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চিত চিত্রকলার বিস্তারও রুদ্ধ হতে থাকে। উচ্চকোটির শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে শূন্যতা নেমে আসে। অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই শূন্যতা খুবই প্রগাঢ় ছিল। এটা হচ্ছে ভারতের ধ্রুপদি শিল্পের বিলয়ের কথা। এরপর আধুনিক যুগের সূচনা হতে প্রায় এক শতাব্দি সময় লেগেছে। সেই সময় বহু ব্রিটিশ শিল্পী এদেশে এসেছেন। তাঁরা এদেশের নিসর্গ ও জীবন অবলম্বনে ছবি এঁকেছেন। বিভিন্ন প্রাক্তন ও অবসিত রাজদরবারের শিল্পীরা ভাগ্যান্বেষণে শহরে এসেছেন। বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটেছে। তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা পাশ্চাত্ত্য স্বাভাবিকতার আঙ্গিক আয়ত্ত করেছেন। এই স্বাভাবিকতার সঙ্গে তাঁদের চর্চিত দেশীয় আঙ্গিকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মিলিয়েছেন। এ থেকে গড়ে উঠল নাগরিক শিল্পের এক নতুন আঙ্গিক, কোম্পানি স্কুল নামে যা পরিচিত। এই দেশীয় শিল্পীরাই ব্রিটিশ শিল্পীদের সান্নিধ্যে এসে স্বাভাবিকতার আঙ্গিকে আর এক ধরনের তেলরঙের ছবি করলেন, যা অনেক সময়ই পুরাণকল্পমূলক এবং লৌকিকের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় ব্যঞ্জিত। আগে এগুলিকে ডাচ-বেঙ্গল বা ফ্রেঞ্চ-বেঙ্গল স্কুলের 'কোম্পানি স্কুল' ও 'অনামা শিল্পীর তেলরং' এগুলি খুব যে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছতে পেরেছিল, তা নয়। গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাস্তবতার প্রতিফলনের দিক থেকে দেখতে গেলে কোম্পানি স্কুল বিষয় নির্বাচনে ছিল অনেক 'সেকুলার', অনেক ছবিতেই বিষয় উঠে আসত সাধারণ জীবন - প্রবাহ থেকে।

প্রাক-আধুনিক পর্বে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চিত্রধারাটি গড়ে উঠেছিল, তা হল কলকাতার কালীঘাটের পট। এই লৌকিক - নাগরিক চিত্রধারায় পৌরাণিক বিষয় নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতাকে চিত্রের বিষয় করে নিতে পারা। বাস্তবের প্রতিফলনের দিক থেকে এর অবদান অতুলনীয়। বাস্তবতাই লৌকিকের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কালীঘাটের পটে সেই বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে। এর আগে লৌকিক শিল্প বাদে অন্য কোনও ধ্রুপদি, নাগরিক বা উচ্চকোটির শিল্পধারায় বাস্তবতার এত অভিনব ও ব্যাপ্ত প্রকাশ ঘটেনি। গণতান্ত্রিকতার দিক থেকেও কালীঘাটের অভিনবত্ব অসামান্য। কালীঘাটের মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এই চিত্রধারা। যাঁরা ছবিগুলি আঁকতেন, তাঁরা ছিলেন লোকশিল্পী। জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন। শহরে বিদেশি শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিকতার রীতির কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন। এই দুয়ের সমন্বয়ে তাঁদের আঙ্গিক সরস ও সরলতার মধ্যেও হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত পরিশীলিত ও দৃঢ় - সংবদ্ধ। ছবি ছিল এই শিল্পীদের জীবিকা। মন্দিরে ভ্রমণার্থী যাঁরা আসতেন তাঁরা ভ্রমণের স্মৃতি - স্বরূপ এই ছবি কিনে নিয়ে যেতেন। এভাবে এই ছবি অজস্র সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর আগে বা পরে আর কোনও নাগরিক চিত্রধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে এভাবে ছড়িয়ে যায়নি। তবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্তও আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা এই চিত্রধারার নান্দনিক গুরুত্ব তেমন করে উপলব্ধি করেননি। কিন্তু বিদেশিরা

তখন থেকেই এই ছবি সংগ্রহ করে তাঁদের দেশে নিয়ে গেছেন। মোটামুটি ১৯৩০ -এর দশক থেকে কালীঘাটের ছবি আমাদের আধুনিক চিত্রকলাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। কালীঘাটের পাশাপাশি বটতলার কাঠখোদাই ছবিও বাস্তবতার ও গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আজ যে ভাবে হচ্ছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সাম্প্রতিক দৃশ্যকলায় বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ সম্পর্কে তার একটা কারণ আমাদের দৃশ্যকলার আধুনিক পর্বে এই দুটি দিকেই যথেষ্ট অভাব ছিল। ১৯৪০ -এর দশকের পর থেকে এই অভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছে। আমাদের আধুনিকতার সূচনা পর্বের দিকে তাকিয়ে এই অভাবের কারণ ও স্বরূপ আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

দৃশ্যকলার আধুনিকতার শুরু ধরা যেতে পারে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ব্রিটিশ অধিপত্য বিস্তারের - সূচনা থেকেই উচ্চকোটির জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিল্পসৃজনের ক্ষেত্রে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। প্রায় এক শতাব্দীর সেই শূন্যতার অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিল যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশে তাঁদের নিজেদের প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য কিছু শিল্পী কারিগর তৈরি করার প্রকল্প নিলেন। এরজন্য তাঁরা কয়েকটি বড় শহরে আর্ট স্কুল স্থাপন করেছিলেন। আমরা জানি ১৮৫০-এ মাদ্রাজে, ১৮৫৪ - তে কলকাতায় ও ১৮৫৬ - তে মুম্বাইতে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই স্কুলে ব্রিটিশ কেনসিংটন স্কুলের আদলে স্বাভাবিকতার রীতিতে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত। এখানে শিখে যেসব শিল্পী বেরোলেন, তাঁরা স্বাভাবিকতার রীতিতে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠলেন। তাঁদের কাজের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে আধুনিক চেতনার সূচনা হল, বলা যেতে পারে। একে আধুনিক বলা যেতে পারে এই কারণেই যে ব্যক্তিশিল্পীর আত্মচেতনা থেকে উৎসারিত হতে পারছিল তাঁদের সৃষ্টি। পূর্ববর্তী যুগে, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক আদিম কাল থেকে অনুচিত্র বা কালিঘাটের পটের সময় পর্যন্ত, ব্যক্তির আত্মতা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্ব পেত না। শিল্প সৃষ্টিতে প্রাধান্য চিল গোষ্ঠিচেতনার। যার ভিতর দিয়ে গণতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য সহজেই উন্মীলিত হতে পারত। শিল্পীর আত্মচেতনা সেই গোষ্ঠীচেতনা বা গণতান্ত্রিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

আধুনিকতার অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিল্পীর আত্মতার প্রকাশ একটি। আমাদের প্রথম পর্বের ব্রিটিশ স্বাভাবিকতাবাদী শিল্পধারায় আধুনিকতার ওটুকুমাত্র বৈশিষ্ট্যই দেখা গিয়েছিল। এছাড়া জীবনভাবনা, সমাজভাবনা, ঐতিহ্যচেতনা ইত্যাদি অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যই ছিল না। এই ধারার শ্রেষ্ঠ দুজন শিল্পী হলেন রবিবর্মা ও বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি বর্মার অবশ্য কোনও আর্ট স্কুলের শিক্ষা ছিল না। তাঁরা স্বাভাবিকতার রীতিতে দৃশ্যমান বাস্তবতাকে যেমন এঁকেছেন, তেমনি দেশীয় পৌরাণিক বিষয় নিয়েও ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তাতে বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ যেমন ছিল না, তেমনি সেই চিত্রধারার সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরও কোনও যোগ ছিল না। রবি বর্মা অবশ্য চেষ্টা করেছেন ছবিকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। এজন্য তিনি ওলিওগ্রাফে ছবির প্রতিলিপি তৈরি করতেন, যাতে অনেক মানুষের কাছে তা পৌঁছায়। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় তাঁর ছবির জনপ্রিয়তাও অবশ্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত ছিল। একেবারে সাধারণত মানুষের ভিতর তা আর কতটুকু সঞ্চারিত হতে পেরেছে? আর জীবনের গভীর বাস্তবতা নিয়েও আধুনিকতার এই প্রথম পর্বের স্বাভাবিকতাবাদী শিল্পীরা ততটা ভাবিত ছিলেন না।

এই যে বিদেশি একটা চেতনা ও আঙ্গিকের উপর জোর দিয়ে শুরু হল আমাদের আধুনিকতা, এরই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষ পর্বে এবং বিংশ শতকের সূচনায় স্বদেশি আন্দোলনের বাতাবরণের মধ্যে। আমাদের আধুনিকতা কেন আমাদের ঐতিহ্যের শিকড় থেকে উন্মীলিত হবে না, জেগে উঠেছিল এই প্রশ্ন। এ বিষয়ে প্রথম ভেবেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। স্বদেশচেতনার এই সন্ধান থেকেই ১৮৯৭ সালে তিনি আঁকলেন তাঁর 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালা। ওই বছরই হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। হ্যাভেল মাদ্রাজ থেকে এসে১৮৯৬ সালে কলকাতার আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁরও লক্ষ্য ছিল এদেশের শিল্পশিক্ষাকে এদেশেরই ঐতিহ্যের গভীর থেকে জাগিয়ে তোলার। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের যৌথ উদ্যোগে আর্ট স্কুলের শিল্পধারায় শুরু হল সেই প্রকল্পের কাজ। এই প্রয়াস ক্রমশ বিস্তৃতি পেতে লাগল। গড়ে উঠতে লাগল জাতীয় চেতনা ও প্রাচ্যচেতনা - আশ্রিত নতুন শিল্পআঙ্গিক, পরবর্তী কালে যা 'নব-ভারতীয় ঘরানা' নামে পরিচিত হয়েছে। এটাকেই বলা যেতে পারে আমাদের আধুনিকতার দ্বিতীয় ধারা।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, কে. ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ শিল্পীর কাজের মধ্যে দিয়ে স্বদেশ চেতনা - অশ্রিত যে শিল্পধারার বিকাশ ঘটল তা ক্রমশ আরও বিস্তৃতি পেল পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের চর্চায়। এই নব্য - ভারতীয় ধারা আমাদের আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। আধুনিকতার একটি জাতীয় আত্মপরিচয় তৈরি করেছিল। পরবর্তী কালে এই আদর্শ থেকে আমাদের আধুনিকতা সরে গেছে। সরে গিয়েও নানাভাবে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তির উপরেও নিজস্ব একটা আত্মপরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। সেখানে নব্য - ভারতীয় ঘরানার আদর্শকে উপেক্ষা করা যায় নি। কিন্তু নব্য - ভারতীয় ঘরানার মধ্যেও বাস্তবতাও গণতান্ত্রিকতার অভাবটা থেকেই গিয়েছিল। বিষয় হিসেবে নব্য - ভারতীয় ঘরানার শিল্পীরা বেছে নিয়েছিলেন পুরাণকল্প, ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়, নিসর্গ এবং একটা আদর্শায়িত সৌন্দর্যের জগৎ। রাজনীতি ও ক্ষয়িষ্ণু বাস্তবতা তাঁদের কাছে প্রথম পর্বে অন্তত তেমন গুরুত্ব পায়নি। এই অভাব নব্য - ভারতীয় ঘরানার একটা সীমাবদ্ধতা।

এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার সমালোচনা অনেক সময়ই তাঁর কাছে প্রতিফলিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে যখন 'আরব্য - রজনী চিত্রমালা' আঁকলেন তাতেও তিনি এই অভাবের গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দিতে পেরেছিলেন। আরব্য - রজনীর পুরাণকল্পের ছদ্মবেশে তিনি সমকালীন কলকাতা ও ঔপনিবেশিকতার অনেক সমস্যার অবতারণা করতে পেরেছেন তাঁর ছবিতে। স্বদেশচেতনা - আশ্রিত আত্মপরিচয়ের মধ্যেও বাস্তবতাকে কিভাবে প্রতিফলিত করানো যায় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত 'আরব্য - রজনী চিত্রমালা'। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে দেখা যায়— নব্য ভারতীয় ঘরানা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি বিস্তৃত হয় নি শিল্পচেতনা।

প্রথম দিকের অভিনবত্ব ও নতুন উন্মেষের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নব্য - ভারতীয় ঘরানা ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এটা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা স্টুডিও গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন শিল্পীদের। তারপর ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তারই অঙ্গ হিসেবে 'কলাভবন' গড়ে তোলেন। কলাভবনে নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে নব্য - ভারতীয় ঘরানার এক নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়। যাতে জাতীয়তার বোধ বিশ্বগত চেতনার সম্মিলনে নবীকৃত হয়ে উঠতে পারে। স্বদেশও শুধু ধর্ম ও পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের বিস্তৃত প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে প্রসারিত হতে পারে। ১৯২০ -র পর থেকে নন্দলাল বসুর কাজে যে পরিবর্তন আসে এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্করের কাজে যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে, সেটা বিশ্বভারতীয় আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনারই পরিণতি। বিংশ শতকের শান্তিনিকেতনেই প্রথম শিল্পকে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্টুডিওর গণ্ডির বাইরে এনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত করার সার্থক প্রকল্প নেওয়া হয়। নন্দলাল ও অন্যান্য শিল্পীরা যে ম্যুরালগুলি করেছেন

সেগুলি বিশভারতী সংলগ্ন মানুষ ছাড়াও বাইরের সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে। রামকিঙ্করের ১৯৩৫ -এ করা 'সুজাতা', ১৯৩৮ -এর 'সাঁওতাল পরিবার', ১৯৫৪ -র 'কলের বাঁশী' ইত্যাদি ভাস্কর্য, ভাস্কর্যের আধুনিকতার যেমন নতুন উন্মেষ ঘটায়, তেমনি সমকালীন বাস্তবতার নানা দিক ও সমস্যাকেও উদ্ভাসিত করে তোলে। বিনোদবিহারীর ১৯৪৬-এর হিন্দীভবনের ম্যুরাল 'মধ্যযুগের সন্তরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাবনাকে আলোকিত করে, যখন দেশ সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এভাবে শান্তিনিকেতন থেকে উন্মেষ ঘটল। শিল্পের বাস্তবচেতনা ও গণতন্ত্রচেতনার এক নতুন দিক যা আধুনিক পর্বে এর আগে কখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ছবিতেও বিশ্বচেতনাকে এমনভাবে মেলালেন, যে তার আধুনিকতার প্রত্যয়কে অনেক দূর প্রসারিত করল। লৌকিকের সরস আবেদনে ছবিকে অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যামিনী রায়ের অবদানও স্মরণীয়।

এরকম একটা প্রেক্ষাপটে আমাদের শিল্পের আধুনিকতা ১৯৪০ -এর দশকে পৌঁছল। চল্লিশের আলোড়িত সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পীরা বাস্তব চেতনা নিয়ে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন। একদিকে বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিস্তার, অন্যদিকে দেশের ভিতর উপনিবেশিক শোষণের তাণ্ডব ঔপনিবেশিকতা বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোড়ন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সব মিলিয়ে যে উত্তাল সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন শিল্পীরা, তার উপযুক্ত শিল্পভাষার সন্ধান ছিল তাঁদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এর আগে যে দুটি প্রধান ধারা, একাডেমিক স্বাভাবিকতা ও নব্য ভারতীয় ঘরানা, এর কোনোটির ভিতরই তারা তাঁদের সময়ে কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন না। শুধু রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতন তাঁদের কাছে নতুন পথের কিছু ইঙ্গিত আনছিল। চল্লিশের শিল্পীরা বাস্তবচেতনাকে যে গভীর গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে চাইছিলেন, তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের কাজে। মার্ক্সীয় আদর্শের প্রেরণায় যেহেতু কাজ করেছিলেন চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোর তাই ছবির মধ্যে দিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যেও। শিল্পকে গণতান্ত্রিক করে তোলার যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল সেই সময়, তা এর পরে আর এক গুরুত্বের সঙ্গে চর্চিত হয়নি। চল্লিশের আর একটা প্রবাহে কাজ করেছিলেন সেইসব শিল্পীরা যাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন আন্দোলন জাগাতে চাইছিলেন। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা গ্রুপ', ১৯৪৭ -এ 'বম্বে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ'। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও গড়ে উঠেছিল এরকম সংঘবদ্ধ আন্দোলন। প্রদোষ দাশগুপ্ত, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, এম. এফ. হুসেন, সুজা প্রমুখ শিল্পী পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে আত্তীকৃত করে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে যে নতুন আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন, তা বাস্তবচেতনাকে নানা দিক থেকে আলোড়িত করেছিল কিন্তু গণতান্ত্রিকতার বিকাশে খুব বড় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৫০ ও ১৯৬০ -এর দশকের শিল্পের বিকাশ, সেই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা খুঁজছিলেন তাঁদের শিল্পের নতুন এক আত্মপরিচয়, যা বিশ্বগত হয়েও ঐতিহ্যের গভীর থেকে উৎসারিত হবে এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতা অনুকৃতিমূলক হবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রেরও বিশেষ একটা ভূমিকা এল বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের এবং শিল্পের গণতান্ত্রিকতাকে প্রসারিত করার। ১৯৫৪ সালে ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ণ আর্ট ও ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হল দিল্লিতে। সারা দেশের আধুনিক শিল্পকলার নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ গড়ে তোলা, সাধারণ মানুষের সামনে তা তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল ন্যাশনাল গ্যালারির। ললিত কলা অ্যাকাডেমির সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল সারা দেশে শিল্পীদের কাজের উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করে তাঁদের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এর মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিকতার একটা লক্ষ্য সাধিত হতে পারত। কিছুটা হয়তো হয়েছেও। কিন্তু তা খুবই সীমিত। কেননা এসব সংগঠনেরও আছে কিছু সীমাবদ্ধতা। সরকারি লাল ফিতের নাগপাশ ছাড়াও আছে চাকুরিজনিত ক্লৈব্য, দলাদলি, স্বজনপোষণ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি নানা সমস্যা। তাই স্বাধীনতাপরবর্তীকালে গণতান্ত্রিকতার বিকাশ সামান্য ঘটলেও সেটা খুবই অপ্রতুল। কেননা দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মান, শিক্ষার মান এতই নিম্নস্তরের যে সে সেখানে প্রয়োজন-অতিরিক্ত কোনও সৌন্দর্যের বোধের সঞ্চার বিলাসিতা বলে গণ্য হয়।

এসমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ষাটের দশকের শিল্পীরা আধুনিকতার আত্মপরিচয় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাঁরা আধুনিকতার যে নতুন মডেল বা প্যারাডাইম তৈরি করেছেন তার ভিতর পূর্ববর্তী আঙ্গিক বা রূপভাবনার সারাৎসারগুলি সঞ্চিত হয়েছে। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তারা তাঁদের বাস্তবতার গহনে প্রবেশ করেছেন। তাকিয়েছেন বিশ্বের দিকেও। এসবের সমন্বয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন এমন এক আঙ্গিক যা শিল্পীভেদে বিভিন্ন হয়েও সামগ্রিক এক ঐক্যে গ্রথিত, যে ঐক্যের উৎস জেগে উঠেছে বাস্তবচেতনা থেকে। ভূপেন খক্কর শহর ও শহরতলির নিম্নমধ্যবিত্ত চেতনার পপুলার আর্টকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন ক্লিষ্ট অস্তিত্বের এক শিল্পরূপ। জগদীশ স্বামীনাথন আদিমতার ভিতর থেকে তুলে এনেছেন আধুনিক সৌন্দর্যের নির্যাস। গণেশ পাইন পুরাণকল্পের গভীর থেকে সৌন্দর্যচেতনা তুলে এনে একদিকে ক্লিষ্ট বাস্তবতা, আর এদিকে আদর্শায়িত সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বিকাশ ভট্টাচার্য অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিককে নবীকৃত করে সমকালীন বাস্তবতার গভীর সংকটের শিল্পরূপ সন্ধান করেছেন। যোগেন যৌধুরী অভিব্যক্তিবাদী রীতির সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে মিলিয়েছেন দেশীয় লৌকিককে আর তা থেকে গড়ে তুলেছেন হিংসা ও সন্ত্রাস অধ্যুষিত আধুনিক বাস্তবতার বিপন্ন রূপ। গণেশ হালুই বাংলার সহজ নিসর্গের রূপান্তরে উদ্বোধিত করেছেন বিশেষ ধারার এক বিমূর্ততা। এভাবে অন্যান্য অনেক শিল্পী তাঁদের নিজস্ব রূপভাবনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের বাস্তবতার যে আলেখ্য তৈরি করেছেন, ততে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার এক সুষম মেলবন্ধন ঘটেছে। বাস্তবতার অনেক গভীরে তাঁরা প্রবেশ করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিকতাকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, তা বলা যায় না। ষাটের শিল্পের বিকাশ অবশ্য গড়ে উঠেছে শিল্পীদের সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। ১৯৬০ -এ কলকাতায় তৈরি হয়েছিল 'সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস', ১৯৬৪ -তে 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স', ১৯৬৩ -তে বরোদায় তৈরি হয়েছিল 'গ্রুপ ১৮৯০'। গণতান্ত্রিকতার বিকাশে এসব সংঘবদ্ধতার খানিকটা ভূমিকা আছে, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই বিচ্ছিন্নতা আধুনিকতারই সমস্যা।

১৯৬০ -এর দশকের আধুনিকতায় এই যে প্যারাডাইম বা রূপের অভিজ্ঞতা, সেটাই প্রবাহিত হয়েছে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত। পরিবর্তন এল ১৯৯০ -এর দশকে। এই পরিবর্তনের পিছনে দুটি ঘটনা বা বিষয় কাজ করেছে। একটি বিশ্বায়ন। দ্বিতীয়টি উত্তর - আধুনিকতা। দুটিই পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভূত এবং আন্তর্জাতিক অনিবার্য যোগসূত্রে এদেশে এসে পৌঁছেছে। এদেশের দৃশ্যকলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যার ফলে আমাদের আধুনিকতার রূপভাবনা ১৮৫০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত যেভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল, তার একটা বিরাট পরিবর্তন এল নব্বইয়ের দশকে এসে। আমাদের এ লেখার মূল আলোচ্য বিশ্বায়ন - পরবর্তী দৃশ্যকলায় বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ। অর্থাৎ বিশ্বায়ন - পরবর্তী দৃশ্যকলায় বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ। অর্থাৎ বিশ্বায়ন আমাদের দৃশ্যকলায় বাস্তবতার প্রতিফলনকে প্রগাঢ় করেছে কিনা বা কোনওভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা এবং দৃশ্যকলাকে আরও সাধারণ মানুষের অধিগম্য করেছে কিনা। সে বিষয়টা বোঝার আগে আমরা আমাদের অবহমানের শিল্পে বাস্তবতা ও গণতান্ত্রিকতার স্বরূপকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

১৯৯০ থেকে আমাদের দেশে বিশ্বায়ন এসেছে উত্তর -ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। এটা অনিবার্য ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির

ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটেছে তাতে বিশ্ব অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই সমগ্র বিশ্ব একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। বিশ্বায়নের দুটি দিক। বিশ্ববাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। উন্নত দেশগুলি বা প্রথম বিশ্ব আমাদের অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। এতে কোনও ক্ষতি ছিল না যদি আমাদের দেশের ছোট ছোট উদ্যোগগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হত এবং আমাদের দারিদ্ররা, আদিবাসী, বনবাসী, কৃষিজীবী মানুষ আরও প্রান্তিক ও দরিদ্রতর না হয়ে যেত। দেশ দুটি ভাগে বিভাজিত হয়ে গেছে। শহরগুলিও উচ্চবিত্ত মানুষ উন্নয়নের আলোয় ঝলমল করছে। আর প্রান্তিক মানুষ আরও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রকল্পে এমন কোনও উদ্যোগ নেই যাতে উন্নয়ন সমগ্র সমাজে সুষমভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। সেটা নেই বলেই আজ সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, মাওবাদী আন্দোলন, নানা সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সারা দেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এই অসম উন্নয়ন, এই নীতিহীনতার বিরুদ্ধে শিল্পকলা বিপুলভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ১৯৯০ -পরবর্তী দৃশ্যকলায় এই প্রতিবাদ গভীর এক মাত্রা পেয়েছে।

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় দিকটি হল, যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে পাশ্চাত্যের শিল্পের সমস্ত নতুন পরীক্ষা - নিরীক্ষা অতিদ্রুত এদেশে পৌঁছে যায় এবং সেই মডেল দ্বারা আমাদের শিল্পীরাও দ্রুত প্রভাবিত হন। ফলে ১৯৯০-এর পর থেকে আমাদের শিল্পের আঙ্গিকে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেক বেড়েছে। ফোটোগ্রাফি, ভিডিও, ইনস্টলেশন, পার্ফর্মেন্স, ইত্যাদি আঙ্গিকগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। কেননা এখননকার বাস্তবতার যে জটিলতা তাকে প্রকাশ করতে গেলে শুধুমাত্র চিত্র - ভাস্কর্যের দ্বিমাত্রিক - ত্রিমাত্রিক আঙ্গিককে অপ্রতুল মনে করছেন শিল্পীরা। এই নতুন আঙ্গিকগুলি কতটা আমাদের বাস্তবতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছে, এর সফলতা তার উপর নির্ভর করে। সফল ক্ষেত্রগুলিতে সেই সমন্বয় ঘটেছে। অনেকসময় আবার সমন্বয়ের অভাব থেকে এইসব আঙ্গিক আমাদের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে।

বিশ্বায়নের সঙ্গে উত্তর - আধুনিকতার প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই। উত্তর - আধুনিকতা বরং বিশ্বায়নের বিপরীত এক প্রত্যয়। উত্তর - আধুনিকতা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা বিশ্বায়ন বাস্তবে হয়ে উঠেছে প্রথম বিশ্বের শোষণের একটা হাতিয়ার। উত্তর - আধুনিকতা ইউরোপে জেগে উঠেছিল আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূত্রে। আধুনিকতার প্রকল্প তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। রেনেসাঁস বা আলোকদীপ্তির মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার, সেই প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিকতা সত্যকে করে তুলেছে অভিধাকেন্দ্রিক ও একমাত্রিক। ভিন্নমতের জন্য কোনও পরিসর রাখতে পারেনি তার ভিতর। যার ফলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। সংঘাতের শেষ হয় না। উত্তর - আধুনিকতা এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে জেগে উঠেছিল। উত্তর - আধুনিকতা উদ্ভূত যে শিল্প তা সত্যের এই নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করেছিল। কোনও সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নয়, এই বোধ থেকে বাস্তবকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছিল। সেজন্যই উত্তর - আধুনিক শিল্পে প্রথাগত রূপরীতিকে অতিক্রমণের চেষ্টা ছিল। একেবারে নিম্নবর্গীয় জীবন থেকে রূপ সন্ধানের প্রয়াস ছিল। নানা প্রত্যয়ের, নানা মাধ্যমের সম্মিলন ছিল।

আমাদের দেশে বিশ্বায়ন ও উত্তর - আধুনিকতা প্রায় একই সময়ে এসেছে বলে দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে এই দুটি দিক প্রায় মিলেমিশে গেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নজনিত বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন উত্তর আধুনিকতার আঙ্গিক। ১৯৯০-এর দশক পরবর্তী সময়ে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের হাতে যে শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে তাতে বাস্তবতার নানামুখী বিশ্লেষণ ঘটেছে। যে অন্যায় ও অবিচার নানা স্তরে জীবনকে পর্যুদস্ত করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় প্রতিবাদ জেগে উঠেছে। প্রতিবাদীচেতনাই বিশ্বায়ন - পরবর্তী দৃশ্যকলার মূল সুর।

বিশ্বায়ন দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে সরাসরি আর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়নের ফলে শিল্প বাজার প্রসারিত হয়েছে। শিল্পের বিপণন বেড়েছে। প্রতিটি বড় শহরে অজস্র আর্ট গ্যালারি খুলেছে। তার মধ্যে শিল্পের ব্যবসা দ্রুত বেড়েছে। মূলধন লগ্নীর একটি বড় ক্ষেত্র হয়েছে শিল্পকলা। গ্যালারির মাধ্যমে এবং অন্যান্য উদ্যোগেও শিল্প সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত হারে। এর ফলে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা শিল্পকলার। অনেক মানুষের আগ্রহী হওয়ায় কতা এ সম্পর্কে। গণতান্ত্রিকতার প্রসার হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা কি হয়েছে। অনেক প্রচারের ফলে কিছু মানুষের মধ্যে সচেতনতা জেগেছে। দর্শকসংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই দর্শক তো শিল্পের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যুক্ত তাঁরা। এর বাইরে সাধারণ মানুষ কতটা আগ্রহী হয়েছেন শিল্প সম্পর্কে? এই যে এত গ্যালারি হয়েছে তার অধিকাংশতেই সাধারণ মানুষের যাতায়াত খুবই সীমিত। ফলে গণতান্ত্রিকতার প্রসার খুব একটা ঘটেনি। যেদেশে দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা এত ব্যাপক সে দেশে সংস্কৃতিমনস্কতাই বা প্রসারিত হবে কী করে? আর বিশ্বায়ন যাঁদের সাফল্য দিয়েছে তাঁরা সেই সাফল্যের গণ্ডিতে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে তাঁদের কোনও সময় নেই নিজের ছাড়া অন্য দিকে মন দেওয়া। ফলে বিশ্বায়ন দৃশ্যকলার গণতান্ত্রিকতার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য কোনও প্রভাব ফেলেনি।

আর একটা ব্যাপার ঘটেছে। বিশ্বায়ন উত্তর - আধুনিকতাকেও গ্রাস করে নিয়েছে। বিশ্বায়ন উদ্ভূত বাজার উত্তর - আধুনিকতা - সঞ্জাত প্রতিবাদী চেতনাকেও কিনে নিতে সমর্থক হয়েছে। ফলে বাজারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ছিল উত্তর - আধুনিকতার, তার আর কোনও ধার নেই আজ। গণতান্ত্রিকতা নেই বলে প্রতিবাদী চেতনাও খুব একটা ফলপ্রসূ হতে পারে না। আমাদের দেশে শিল্পের বাজারের যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল ২০০৪ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে, ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বমন্দারই আক্রমণে তা আবার স্তিমিত হয়েছে। ফলে অনেক গ্যালারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক উদ্যোগ সংকুচিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও শিল্পকলার বৈচিত্র ও সজীবতা এখনও যথেষ্টই আশাপ্রদ। এখনও দৃশ্যকলাই প্রধান একটি প্রকাশ - মাধ্যম যার ভিতর দিয়ে একটি জাতির প্রাণসন্ধানের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিকতা মানুষের এক আত্মতার গণ্ডিতে অবরুদ্ধ করেছে যে শিল্পকলার পক্ষে সকল মনুষের কাছে পৌঁছানো আজ খুব দূরতর স্বপ্ন।